৮

ইংরেজ শাসন ও আধুনিক ভারত

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ছিল বহুমাত্রিক। এর ফলে ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই ইউনিটের প্রথম পাঠে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন এবং তৃতীয় পাঠে নবজাগরণের উন্মেষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পাঠে যথাক্রমে সর্বভারতীয় ও বাংলার মুসলমানদের জাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর কার্যাবলীর মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে। মোট কথা, ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের শুরু থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের মূলধারা এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ঔপনিবেশিক অর্থনীতি
- পাঠ-২. পাশ্চাত্য ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার প্রচলন
- পাঠ-৩. নবজাগরণ
- পাঠ-৪. আলীগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণ
- পাঠ-৫. বাংলায় মুসলিম জাগরণ ঃ আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী

পাঠ - ১

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন;*
- *ভূমি ব্যবস্থার এবং ভূমি মালিকানার পরিবর্তন ও ফলাফল জানতে পারবেন;*
- *শিল্পোন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার অভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *ভারতের সম্পদ পাচার এবং ভারতীয়দের দারিদ্র্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠাকালে ভারতের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। পরিপূরক হিসেবে ছিল কুটির শিল্প যার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় এবং শৌখিন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হতো। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম এবং প্রধান অর্থনৈতিক ফল হলো একদিকে কৃষি বিষয়ক সম্পর্ক তথা ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন এবং অন্যদিকে কুটির শিল্পের বিশেষত বয়ন শিল্পের ধ্বংস সাধন। উভয়বিধ পরিবর্তন সাধিত হয় ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থের তাগিদে। যেহেতু বাংলায় সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই এই অর্থনৈতিক ওলটপালটের প্রাথমিক ধাক্কা এই অঞ্চলেই লাগে।

প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনামলে উপমহাদেশের অর্থনীতি কৃষি প্রধানই থেকে যায়। তথাপি কিছু শিল্প-কারখানা ভারতবর্ষের প্রধান শহরগুলোতে গড়ে ওঠে। তবে কৃষি অথবা শিল্প যে ক্ষেত্রেই হোক না কোন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি রচিত হয় বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিরিখে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যে সমস্ত উপাদান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বের দাবিদার সেগুলো হচ্ছে–

(১) প্রায় সমসাময়িক কালে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব এবং এদেশীয় অর্থনীতির ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব, (২) নতুন ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন, এবং (৩) ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষীয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় চাহিদা বিদ্যমান ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করে। বাংলার কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প অগ্রগণ্য ছিল। ঢাকার মসলিনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকায় নির্মিত হতো ধাতব দ্রব্য এবং কাষ্ঠ নির্মিত নানা দ্রব্য সামগ্রী। ইংল্যান্ডের সফল শিল্প বিপ্লবের পর সেখানে কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য অনেক সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যায়। ফলে ভারতবর্ষের হস্তনির্মিত দ্রব্যাদি প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। এইভাবে দেশীয় শিল্পের অবনতি ও ধ্বংসের পথ

সুগম হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি উপরোক্ত অর্থনৈতিক প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করে। ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বস্ত্রাদি রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়– যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৃটিশ বস্ত্রশিল্পকে উৎসাহিত করা। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে অনুসৃত মুক্ত বাণিজ্য নীতির ফলে ভারতে বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের অবাধ আগমন ঘটতে থাকে। দেশীয় শিল্পকে রক্ষার কোন চেষ্টা ঔপনিবেশিক সরকার করেনি; কারণ নিজ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন ভূমি ব্যবস্থা এবং ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি ভারতবর্ষের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী ছিল। ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বাংলাতেই প্রথম আরম্ভ হয়। ১৭৬৫ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মুঘল সম্রাট কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী প্রদানের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত ঘটে, এবং ১৭৯৩ খ্রি. ভারতে কোম্পানির কর্ণধার লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে এর একটি পর্যায় শেষ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারা জমির সত্যিকার মালিক হয়ে যায় এবং জমির ওপর কৃষকের অধিকার হরণ করা হয়। অথচ প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকই ছিল বস্তুতপক্ষে ভূমির মালিক এবং জমিদারগণ রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র। ভূমি মালিকানার পরিবর্তনের প্রভাব বাংলার অর্থনীতিতে অত্যন্ত ক্ষতিকারক ছিল। এর সামাজিক-রাজনৈতিক ফলও সুখকর হয়নি। জমিতে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে কৃষকের ওপর বৈধ এবং অবৈধ করের বোঝা বেড়ে যায়। অল্প সংখ্যক সুবিধাভোগী, রাজানুগত শ্রেণীর জন্ম হয়, বেশিরভাগ ভূমি-নির্ভরশীল মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। জমির মালিকানা পেলে জমিদারগণ স্বীয় চেষ্টায় ভূমির উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও কৃষি বিপ্লব সাধন করবে– লর্ড কর্নওয়ালিসের এই আশা সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছিল। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানিও খুব বেশি লাভবান হয়নি। জমিদার কর্তৃক সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরতরে নির্ধারিত হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে ভূমির মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত বাড়তি আয় থেকে সরকার বঞ্চিত হয়। এই বন্দোবস্তে শুধু লাভবান হয় জমিদার এবং জমিদার কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী। এই কারণে কোম্পানির শাসন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত হওয়ার পর ঔপনিবেশিক সরকার ঐ সমস্ত অঞ্চলে (অর্থাৎ ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ) এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনে বিরত থাকে।

বাংলার কৃষকের শোচনীয় অবস্থার নিরসনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। শুধু ১৮৫৭ খ্রি. কোম্পানির শাসনের অবসান এবং বৃটিশ রাজের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরবর্তীকালে জমির ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু সীমিত আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়; যেমন: ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব আইন (Rent Act) এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিস্বত্ব আইন (Tenancy Act)।

কোম্পানির শত বছর শাসনকালের বেশিরভাগ সময়ই ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্থবির। কোম্পানির নীতিই এর জন্য মূলত দায়ী ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক শাসনভার ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে কিছুটা অর্থনৈতিক পরিবর্তন তথা উন্নয়নের আভাস লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাড়তি জনসংখ্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ইতোমধ্যে সাধিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য এই পরিবর্তনের জন্য প্রধানত দায়ী। এই সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের আশেপাশে কিছু কলকারখানা স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বোম্বাইতে প্রাথমিক পর্যায়ে স্থাপিত হয় বস্ত্রকল এবং কলিকাতায় পাটকল। পরবর্তী প্রায় একশত বছর অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত পরাধীন ভারতের শিল্পায়নের ধারায় কয়েকটি বিশেষত্ব প্রতিভাত হয়; যেমন– (১) ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক শিল্পায়ন নিরুৎসাহিত করার নীতি সত্ত্বেও কিছু মানুষের ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে

ভারতের সীমিত শিল্পায়ন, এবং (২) বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভোগ্যপণ্য উৎপাদন যার ফলে যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ইত্যাদির জন্য বৃটিশ ভারত সবসময় বৈদেশিক আমদানীর ওপর নির্ভরশীল ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও লেখালেখি শুরু হয়। এই ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন দাদাভাই নওরোজী। ১৮৭১ খ্রি. প্রকাশিত তাঁর 'Poverty and the Un-British Rule in India' শীর্ষক পুস্তকে তিনি সর্বপ্রথম এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তিনি লিখেন যে, বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ফল হচ্ছে ভারত থেকে অবিরামভাবে ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার হওয়া। এই ছিল বিখ্যাত Drain Theory বা সম্পদ পাচার তত্ত্বের মূলকথা। পরবর্তী সময়ে আরো অনেক অর্থনীতিবিদ ও জাতীয়তাবাদী নেতা এই তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনায় ব্রতী হন। ভারতের দারিদ্র্যের সঙ্গে এই সম্পদ পাচারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে যায়। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নাম উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, সম্পদ পাচারের সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর দারিদ্র্যের একটা কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান; কারণ ভূমি রাজস্বই ছিল পাচারকৃত সম্পদের প্রধান উৎস। Drain Theory পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বিশ শতকের শুরুতে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে বেশি জমির অধিকারী কৃষককুলের আর্থিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয়। বাংলার পাটের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এটি সম্ভব হয়। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ধীরগতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চলতে থাকে। শতাব্দীর শুরুতে ভারতের শিল্প মূলধন ছিল খুব স্বল্প পরিমাণ। বিশেষত কৃষি মূলধনের তুলনায় শিল্প মূলধনের স্বল্পতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১৯১৩ খ্রি. মোট কৃষি পণ্যের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা এবং কৃষি ভূমির মোট আনুমানিক মূল্য ছিল ৪০০০ কোটি টাকা। একই সময়ে শিল্পখাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ কোটি টাকা। প্রয়োজনীয় আর্থিক অবকাঠামোর অভাব এবং ভূমির দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি ছিল এই অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৮ খ্রি.) ভারতীয় অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কৃষি দ্রব্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে ভূমিহীন কৃষক এবং স্বল্প আয়ের মানুষের দুর্গতি বাড়ে, যদিও স্বচ্ছল কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯১৮–১৯ খ্রি. ভারতের বিভিন্ন এলাকায় অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানি ঘটে এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। তবে অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণ গম এবং বার্মা (যা তখন বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) থেকে চাল আমদানি করার ফলে ভারত ব্যাপক দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পায়। যুদ্ধের ফলে শিল্পায়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এতোদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র বস্ত্রশিল্প এবং পাট শিল্পই ছিল প্রধান। এখন ঔপনিবেশিক সরকার শিল্পোন্নয়নের গুরুত্ব বুঝতে পারে; কারণ বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য কেবল বৈদেশিক আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা যুদ্ধকালে বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। বিশেষত লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটা সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে। Tata Iron and Steel Company এই সময় প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে এবং প্রচুর মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও যুদ্ধের সময় শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনযাত্রা কষ্টকর হয়ে যায়। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব এর প্রধান কারণ। বস্তুত, যুদ্ধের কারণে ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। যুদ্ধের সময় বাংলার পাটচাষী এবং পাটকল মালিক উভয়ই লাভবান হয়। পাটশিল্পের প্রবৃদ্ধি যুদ্ধের পরও অর্থাৎ ১৯২০-এর দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কয়েক বছর বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছিল তার ঢেউ ভারতবর্ষেও লাগে। কৃষিজাত সামগ্রীর দাম কমতে থাকে। সরকার পড়তি দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন

বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। অতপর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাদেশিক সরকার কৃষকদের দুরবস্থা লাঘবের জন্য এগিয়ে আসে। তবুও অর্থনৈতিক মন্দার ক্ষতিকর প্রভাব শহর অপেক্ষা গ্রামেই বেশি অনুভূত হয়। এ কারণে ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় রাজনীতির মূল সামাজিক ভিত শহর থেকে গ্রামে সরে আসে। এ বাস্তবতা পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৩৯ খ্রি. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উপর্যুক্ত প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। তদুপরি সরকারি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ও মজুতদারীর ফলে ১৯৪৩ খ্রি. বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দুইশত বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। এ কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল অনেক পিছিয়ে থাকে যার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এখনও চলছে।

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের ঐতিহ্যিক অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়নি। কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। সরকারি নীতির কারণে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা অপ্রতুল ছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থার চাপে সাময়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও তাতে শ্রেণী স্বার্থই লাভবান হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতবর্ষ অনুন্নত এবং বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। S.S.M. Desai, *Economic History of India,* Delhi, 1990.

২। Dietmar Rothermund, *An Economic History of India: From Pre-Colonial Times to 1991,* New York, 1993.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলার কোন শিল্পকে সর্বপ্রথম ধ্বংস করে?

(ক) পাট শিল্প (খ) বয়ন শিল্প

(গ) জাহাজ নির্মাণ শিল্প (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়–

(ক) ষোড়শ শতাব্দীতে (খ) সপ্তদশ শতাব্দীতে

(গ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে (ঘ) উনবিংশ শতাব্দীতে।

৩। সম্পদ পাচার তত্ত্বের পথিকৃৎ কে ছিলেন?

(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) দাদাভাই নওরোজী

(গ) বল্লভ ভাই প্যাটেল (ঘ) উল্লেখিত কেউই নন।

৪। ভূমিস্বত্ব আইন প্রণীত হয়–

(ক) ১৮৮৫ খ্রি. (খ) ১৮৫৯ খ্রি.

(গ) ১৯১৩ খ্রি. (ঘ) ১৯২০ খ্রি.।

৫। বাংলায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কারণ–

(ক) অনাবৃষ্টির কারণে শস্যহানি (খ) মজুতদারী

(গ) খাদ্যশস্য রপ্তানি (ঘ) বন্যা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি?

২। Drain Theory ব্যাখ্যা করুন।

৩। ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কি প্রভাব ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে শিল্পায়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

পাশ্চাত্য ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার প্রচলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;*
- *১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *ইংরেজি ভাষা প্রচলন সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *আধুনিক শিক্ষা বিস্তার প্রধান পর্যায়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে ভারতবর্ষের বেশির ভাগ অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গে উপমহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, যার মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে।

অবশ্য বণিক কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পরপরই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়নি। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুনাফা অর্জনই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য, শিক্ষা বিস্তার নয়। কাজেই প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সযত্নে অনুসৃত হয়। বরঞ্চ সরকারি উদ্যোগে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানির প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রি. কলিকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯২ খ্রি. বেনারস হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। কোম্পানির কর্মচারীদেরকে এদেশীয় ভাষা-সংস্কৃতি ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে শিক্ষার ব্যাপারে পরিবর্তনের হাওয়া বইতেও বেশি সময় লাগেনি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন এই পরিবর্তনের সূচনা করে। এই আইনের মাধ্যমে বৃটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেয়। সে অনুসারে কোম্পানির কর্মকর্তাগণ শিক্ষাখাতে প্রথমবারের মতো ১০,০০০ পাউন্ড (প্রায় এক লক্ষ টাকা) ব্যয় বরাদ্দ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন এই টাকা অব্যবহৃত ছিল। কারণ শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে সে প্রশ্নে কোম্পানির ভারতীয় কর্মকর্তাগণ মনস্থির করতে পারছিলেন না। এই বিষয়ে প্রধান দু'টো দল ছিল– প্রাচ্যবাদী (Orientalists) এবং পাশ্চাত্যবাদী (Anglicists)।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন শিক্ষা বিস্ত্মারে সরকারি উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছিল তখন কলিকাতার কতিপয় গণ্যমান্য নাগরিক (হিন্দু ও খ্রিস্টান) একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। এটাই ১৮১৭ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ যেখানে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল। একই সময়ে প্রধানত কলিকাতা শহরে বেশ কিছু ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ। এভাবে বাংলায় অত্যন্ত সীমিত আকারে আধুনিক শিক্ষা চালু হয়।

সরকারি মহলে Anglicist-Orientalist বিতর্কের অবসান হতে আরও অনেক বছর সময় লেগে যায়। ১৮২৮ খ্রি. উদারনীতির অনুসারী লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বড়লাট হয়ে আসেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো শিক্ষা সংস্কারেও তিনি মনোযোগ দেন। অনেক বিতর্কের পর তাঁর শাসনকালের শেষ পর্যায়ে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খ্রি. Council-এর আইন বিষয়ক সদস্য টমাস বেবিংটন ম্যাকলে (Thomas Babington Macaulay) তাঁর বিখ্যাত স্মারক পেশ করেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে তিনি জোরালো মত প্রকাশ করেন যা বড়লাটের কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়। এরপর এ ব্যাপারে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, সরকারি অর্থ এবং উদ্যোগ কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিয়োজিত হবে। সংগত কারণেই ম্যাকলের শিক্ষা বিষয়ক স্মারক ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা বিস্ড়রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে।

প্রায় একই সময়ে শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা উইলিয়াম এডাম আরও ব্যাপকতর শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এডাম শিক্ষা বিস্তারের মূল ইউনিট হিসেবে গ্রামকে গণ্য করেন এবং নিম্নপর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকারি বরাদ্দের সুপারিশ করেন। মোট কথা তিনি শিক্ষার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার সুপারিশ করেন।

কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এডামের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতি ছিল না। আর্থিক বিবেচনাই ছিল এ ব্যাপারে প্রধান বাধা। ফলে তথাকথিত Filtration তত্ত্বের ভিত্তিতে যে শিক্ষানীতি প্রচলিত হয় তা দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে। Filtration তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীকে সরকারি প্রচেষ্টায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা হলে তারাই নিম্নতর শ্রেণীসমূহের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু বাস্তবে এই তত্ত্ব কার্যকরী হয়নি।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ইংরেজি শিক্ষার নীতিগত লক্ষ্য ১৮৩৫ খ্রি. স্থিরীকৃত হয়ে যায়। অতপর ১৮৩৭ খ্রি. সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসেবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু হয়। ইংরেজি রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে প্রচলিত হওয়ার আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া অনেক সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কারণ, এরপর থেকে এই ভাষায় পারদর্শিতা সমস্ত বৈষয়িক উন্নতির চাবিকাঠিতে পরিণত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উডের ডেসপাচ (Wood's Despatch)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট চার্লস উড এটা পাঠিয়েছিলেন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিস্তারিত রূপরেখা এতে সন্নিবেশিত হয়। নীতিগতভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে মত দিলেও এই স্মারক আর্থিক রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত ছিল না। সরকারি অনুদানের সাথে সাথে বেসরকারি উৎসের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের উপর এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য, ভারতীয়দেরকে শিক্ষাদান কোম্পানির সরকারের একটি 'পবিত্র দায়িত্ব' একথা উডের ডেসপাচ কর্তৃক সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। তবুও বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার নীতি অব্যাহত থাকে।

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখিত চিন্তা-ভাবনা এবং সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাংলায় নতুন শিক্ষার প্রচলন ব্যাপক ও দ্রুততর হয়। এর প্রধান কারণ কলিকাতাকে ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার মধ্যে নিহিত ছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর জেলা সদরে অনেক কলেজ স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ হুগলী কলেজ (১৮৩৬), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৫), বহরমপুর কলেজ (১৮৫৩), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), জগন্নাথ কলেজ (১৮৮৪), ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), মুরারীচাঁদ কলেজ (১৮৯১), এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৯৮), ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) ইত্যাদি।

ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়– কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ১৮৫৭ খ্রি. স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মূলত কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাদানে তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত ছিল। এইভাবে উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়। পরবর্তীকালে এর প্রসার ঘটে। আধুনিক শিক্ষার ফল হিসেবে বাংলায় এবং ভারতের অন্যত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত এবং একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায় এই নতুন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল বিধায় তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সর্বাগ্রে সাধিত হয়। বিভিন্ন কারণে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে দেরি করে। ফলে জীবনের সব ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রায় সর্বত্র এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার বৈষম্য তাদের পরবর্তী রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করে। এইভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর্থিক এবং সামাজিক ভিত্তি রচিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক বাংলায় তথা ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না; কারণ এটি ছিল মূলত একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়। শিক্ষার মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে দীর্ঘ বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অবশেষে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ম্যাকলের সুবিখ্যাত স্মারকের মাধ্যমে এই বিতর্কের অবসান হয়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৩৭ খ্রি. ইংরেজি সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। সরকার শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নে পুরো আর্থিক দায় গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে সচেষ্ট ছিল। তথাপি উনিশ শতকের শেষার্ধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের ফলে নবজাগরণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলিকাতা, ১৯৮৭।
২। Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh, 1704-1971*, Vol.III, Dhaka, 1992.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন–
(ক) ওয়ারেন হেস্টিংস (খ) লর্ড কর্নওয়ালিস
(গ) আমীর আলী (ঘ) উপরের সকলেই।

২। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়–
(ক) ১৭৯২ খ্রি. (খ) ১৮০০ খ্রি.
(গ) ১৮৫৭ খ্রি. (ঘ) ১৯৫৭ খ্রি.।

৩। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার আইন প্রণীত হয়–
(ক) ১৮০২ খ্রি. (খ) ১৮৩৫ খ্রি.

(গ) ১৮১৩ খ্রি. (ঘ) ১৯১৩ খ্রি.।

৪। আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল–

(ক) কলিকাতা (খ) মাদ্রাজ

(গ) দিল্লি (ঘ) বোম্বে।

৫। ভারতবর্ষে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়–

(ক) ১৮৫৭ খ্রি. (খ) ১৮৮২ খ্রি.

(গ) ১৯০৫ খ্রি. (ঘ) ১৯২০ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে প্রধান বিতর্কের বিষয় কি ছিল?

২। ম্যাকলের স্মারকলিপির তাৎপর্য কি?

৩। উড্-এর স্মারকের মূল বক্তব্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পটভূমি ও ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

নবজাগরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *নবজাগরণ কি তা জানতে পারবেন;*
- *নবজাগরণের প্রধান ব্যক্তিবর্গ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন;*
- *ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন বর্ণনা করতে পারবেন।*

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং নতুন সাহিত্য বিকশিত হয়। জীবনের সবক্ষেত্রে এই নবচিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ডক নবজাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা ছিল এই নবজাগরণের প্রধান অনুঘটক। অনেক সময় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনায় একে বাংলার রেনেসাঁস বলেও অভিহিত করা হয়। স্থানিক ও কালগত ব্যবধানের কারণে বাংলার এই জাগরণ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে পুরোপুরি তুলনীয় হতে পারে না। এজন্য অনেকে একে রেনেসাঁস বলতে নারাজ, এমনকি নবজাগরণ বলতেও আপত্তি করেন। ফলে অনেক অনর্থক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এর দ্বারা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হয়। একই মানদন্ডে বাংলার নবজাগরণের বিশ্লেষণান্তে দেখা যায় যে, এর ফলে কার্যত মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। ইউরোপের ক্ষেত্রে এটা সর্বোতভাবে সত্য, বাংলার ক্ষেত্রে অংশত। বাংলার নতুন চিন্তা ও কার্যাবলী লক্ষ্য করলে এটা বোধগম্য হয়। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, নতুন ভাবধারা সব সম্প্রদায় ও শ্রেণীকে সমভাবে প্রভাবিত করেনি। তবুও এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। বাংলার নবজাগরণের মধ্যে অপূর্ণতা ছিল, ব্যর্থতাও ছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁস আরম্ভ হয় স্বাধীন নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ ইতালিতে, কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন।

বৃটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের মধ্যে নবজাগরণের বীজ নিহিত ছিল। নতুন শাসন ব্যবস্থা বাংলায় প্রথম শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ নবজাগরণের প্রথম পদধ্বনি বাংলাতেই শোনা যায়। সেই বিবেচনায় ইউরোপে ইতালির যে ভূমিকা ছিল ভারতবর্ষে বাংলার সে ভূমিকা ছিল। ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট, যা ছিল সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন ভেঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েমের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এই মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করলে বাংলার নবজাগরণের অপূর্ণতাসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলার আর্থ-সামাজিক বিবর্তন ইউরোপের সামন্তবাদ থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। এখানে বৃটিশ শাসনের ফলে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূচনা হয়, কিন্তু একই সঙ্গে ১৭৯৩ খ্রি. প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক নতুন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারও সূত্রপাত হয়। বস্তুত, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের সহাবস্থান ছিল ভারতবর্ষে

বৃটিশ শাসনের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কাজেই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাও ছিল বাংলার নবজাগরণের অন্যতম উপাদান।

নবজাগরণ একদিনে শুরু হয়নি এবং স্বল্পকালের মধ্যে শেষও হয়নি। পুরো উনিশ শতক ছিল এর সময়কাল যার পরিসীমায় নবজাগরণের বহুমাত্রিক বিস্তার ঘটে। তথাপি রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) স্থায়ীভাবে কলিকাতা শহরে বসবাস শুরু করার বছর অর্থাৎ ১৮১৪ সালকে নবজাগরণের প্রারম্ভিক বছর গণ্য করা হয়ে থাকে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে নতুন চিন্তাধারার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। বাংলার নবজাগরণের প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। একই সাথে তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে বিধৃত আছে নবজাগরণের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা। রামমোহন বৃটিশ শাসনকে ভারতের জন্য বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও তিনি সমর্থক ছিলেন; এই বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণীর একজন ছিলেন রামমোহন। তাঁর ধর্ম তথা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই সীমিত ছিল। তবুও সময়ের বিচারে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তা ও সংস্কারমূলক কর্মের মুখ্য প্রতিভূ। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে কেউই চিন্তা ও কর্মের ব্যাপ্তিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর লেখনীর মধ্যে তাঁর ধ্যান-ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি আরবি-ফারসি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর একেশ্বরবাদী পুস্তক "তুহফাতুল মুয়াহিদীন" ফারসি ভাষায় লিখিত এবং উনিশ শতকের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার আগে থেকেই রামমোহন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তৎপর ছিলেন। রাম মোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তার ফলস্বরূপ ১৯২৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মসভা। ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে রামমোহন সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সতীদাহ প্রথা রদের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। তিনি এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে জনমত গঠন করেন এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ককে নৈতিক সমর্থন দান করেন। ১৮২৯ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বেআইনী ঘোষণা করেন। এভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার নির্মূলের মধ্য দিয়ে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়। তবে নতুন ভাবধারার সঙ্গে পুরাতন ধ্যান-ধারাও ক্রিয়াশীল ছিল। রামমোহনের প্রথাবিরোধী ধর্মবিশ্বাসের জন্য অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তাঁর নেতৃত্বে গোঁড়া হিন্দুগণ সতীদাহ প্রথার স্বপক্ষে বৃটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সময়ের দাবি উপেক্ষা করে এই অমানবিক প্রথা টিকিয়ে রাখা রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর অনুসারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে বিত্তশালী হিন্দুদের উদ্যোগে স্থাপিত এই কলেজ বাংলার নবজাগরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি ডিরোজিওর (১৮০৭–৩১) অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বল্পায়ু ডিরোজিও ছিলেন একাধারে অধ্যাপক, কবি, দার্শনিক এবং মুক্ত চিন্তার অগ্রনায়ক। যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছিল তাঁর জীবন দর্শন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। শুধু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের মধ্যে তাঁর কার্যক্রম সীমিত ছিল না। সাহিত্য সভা ও বিতর্ক সভার মাধ্যমে তিনি কলেজের সেরা ছাত্রদেরকে নিজের চিন্তা-ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে মুক্তচিন্তা চর্চায় উৎসাহিত করতেন। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত হলেও তাঁর কবিতায় দেশপ্রেমের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুত, পরবর্তীকালে স্বাদেশিকতা বলতে যা বোঝায় তার প্রাথমিক স্ফূরণ হয় তাঁর কবিতায়।

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের কার্যাবলীতে প্রচলিত সামাজিক রক্ষণশীলতা বিশেষত হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পায়। এঁরা ছিলেন র‍্যাডিকেল চিন্তাধারার সোচ্চার প্রতিনিধি। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীরা চেয়েছিলেন ধর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার; ডিরোজিয়ানদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন এবং নতুন সমাজ গঠন। রামমোহন রায়ের মতাদর্শ ডিরোজিয়ানদের নিকট সুবিধাবাদী বলে প্রতীয়মান হয়। ক্রমশ এই র‍্যাডিকেলদের কেউ কেউ মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা মদ্যপান ও গো-

মাংস ভক্ষণের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি নিজেদের ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ করতে থাকেন। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পদচ্যুত করে। তাঁর বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রদের নৈতিক অধপতন ঘটানোর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অল্প কয়েকমাস পর মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ডিরোজিওর শিষ্যগণ তাঁর মৃত্যুর পরও কলিকাতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় ছিলেন। শেষতক তাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত হন। তাঁদের মধ্যে বয়সের অনুপাতে পরিণত বুদ্ধি ও সমাজ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ডিরোজিয়ানগণ তাঁদের গুরুর জীবদ্দশায় এনকোয়ারার (Enquirer) এবং জ্ঞানান্বেষণ নামক দু'টি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

এই পত্রিকা দু'টিতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারিত হয়। এসবের মধ্যে ছিল জুরির বিচারের অধিকার, আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রচলন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাকার দাবি-দাওয়া। ১৮৪২ খ্রি. ইয়ং বেঙ্গলগণ একটি নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন; এর নাম ছিল Bengal Spectator। এই পত্রিকায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতামত সম্বলিত লিখা স্থান পেত। ১৮৫১ খ্রি. বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন প্রক্রিয়ায় ডিরোজিয়ানদের অনেকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব কমতে শুরু করে। ঐ সময়কার সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রধান পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–৯১ খ্রি.)। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজে মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাসাগর অধিকতর সামাজিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। আইনের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলন সহজসাধ্য হলেও একে সত্যিকার সামাজিক রীতিতে পরিণত করা খুবই কঠিন ছিল। বরাবরের মতো এ ব্যাপারেও সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামিই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। একই কারণে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারেও ঈশ্বরচন্দ্রের সাফল্য ছিল সীমিত। তবুও এসব সংস্কারের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বহুবিবাহ এবং বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। বাঙালি হিন্দু সমাজের সার্বিক কল্যাণই ছিল বিদ্যাসাগরের সংস্কার কার্যাবলীর মূল লক্ষ্য। সংস্কারমুক্ত মন ও জীবনবোধে উনিশ শতকের বাংলায় তাঁর সমকক্ষ পাওয়া ভার।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ নবজাগরণের অন্যতম ফলস্বরূপ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যের বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য লেখকদের হাতে বাংলা গদ্য পরিণত রূপ পায়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন নাটক, কবিতা ইত্যাদিও পরিশীলিত ও আধুনিক রূপ ধারণ করে।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের অনেক দুর্বলতা ও অপূর্ণতা ছিল। মূলত হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নতুন চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। মুসলিম সম্প্রদায় ছিল এই নবজাগরণের পরিধির বাইরে। এর প্রধান কারণ, মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহা। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলায় যে বহুমাত্রিক পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে যায় তাকে অবশ্যই নবজাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে। এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ শুরু হয়। ইংরেজ শাসনের ফলে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন এর প্রধান কারণ। এই নতুন ভাবধারার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটে; যেমন– ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার, আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব ইত্যাদি। মোটকথা, মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের পার্থক্য নির্দেশক কর্মকান্ডই ছিল নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যার ফলে বাংলা তথা ভারতে আধুনিকতার সূচনা হয়।

অবশ্য নবজাগরণ সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীকে সমানভাবে প্রভাবিত করেনি। আধুনিক শিক্ষার অসম বিস্তার এর মূল কারণ। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নবজাগরণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, কলিকাতা, ১৯৭৯।
২. A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Changes in Bengal, 1818-1835,* Calcutta, 1965.
৩. Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance,* Calcutta, 1979.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয় কোন শতাব্দীতে?
(ক) ষোড়শ (খ) সপ্তদশ
(গ) অষ্টাদশ (ঘ) উনবিংশ।

২। নবজাগরণের ফলে বাংলায়–
(ক) প্রাচীন যুগ শেষ হয় (খ) মধ্য যুগ শুরু হয়
(গ) আধুনিক যুগ শুরু হয় (ঘ) কোনটিই সত্য নয়।

৩। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের–
(ক) পুরোপুরি মিল আছে (খ) কোন মিল নাই
(গ) আংশিক মিল আছে (ঘ) কোনটিই সত্য নয়।

৪। রামমোহন রায় কোন সাল থেকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন–
(ক) ১৮১৪ (খ) ১৮১৭
(গ) ১৮২০ (ঘ) ১৮৩০।

৫। নিম্নের কোন পত্রিকার সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী জড়িত ছিল?
(ক) সম্বাদ কৌমুদী (খ) সমাচার দর্পন
(গ) বেঙ্গল গেজেট (ঘ) জ্ঞানান্বেষণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। নবজাগরণ বাংলায় প্রথম শুরু হয় কেন?
২। বাংলার নবজাগরণে হেনরী ডিরোজিওর ভূমিকা কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠ - ৪

আলীগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আলীগড় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে স্যার সৈয়দের মতামত সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *রাজনীতিতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সম্বন্ধে স্যার সৈয়দের মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

১৮৫৭ খ্রি. সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময় ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকগণ বিদ্রোহের সার্বিক দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে তাদের উপর নানা ধরনের উৎপীড়ন চালাতে শুরু করে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অধিকতর দুর্দশার কারণ হয়েছিল; সিপাহী বিদ্রোহ উত্তরকালে এই দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এই সময়ে উত্তর ভারতে মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)। তিনি ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের পুরোধা। এই আন্দোলনের মূলকথা ছিল– (১) মুসলিম সম্প্রদায়ের ইহজাগতিক উন্নতি; (২) বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন, এবং (৩) আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক আত্মোন্নয়ন ও হিন্দুদের সাথে সমমর্যাদার আসন লাভ করা। এই লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে আলীগড় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তিনি এই শহরে মোহামেডান এ্যাংলো-অরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। স্কুল শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ খ্রি. এবং কলেজ শাখা ১৮৭৭ খ্রি.। পরবর্তীকালে এই কলেজ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত হয়।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দিল্লির এক অভিজাত পরিবারে সৈয়দ আহমদ খান জন্মগ্রহণ করে। তার পূর্বপুরুষগণ মুঘল দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দিল্লির বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র বিদ্যালয়ে আরবি, ফারসি ও উর্দুতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৩৮ খ্রি. সৈয়দ আহমদ খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে মুন্সেফের পদে যোগদান করেন।

সিপাহী বিদ্রোহ যখন শুরু হয় তখন তিনি বিজনোর শহরে কর্মরত ছিলেন। এই শহরের ইংরেজ অধিবাসীগণ বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। সৈয়দ আহমদ খান অত্যন্ত সুকৌশলে বিদ্রোহীদের নেতার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ইংরেজদের জীবন রক্ষা করেন। পরবর্তী সময়ে বিজনোরের ইংরেজ কালেক্টর সৈয়দ আহমদের এই কাজের প্রশংসা করেন এবং কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। এভাবে সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ শাসকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন, যা আলীগড় আন্দোলনে তাঁর সহায়ক হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী দিনসমূহ সৈয়দ আহমদ খান শাসক গোষ্ঠীর আক্রোশ থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার কাজে মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি 'The Causes of Indian

Revolt' নামক একখানা পুস্তিকা রচনা করেন। মূল পুস্তিকাটি উর্দু ভাষায় লিখিত ছিল। বিদ্রোহের প্রধান দায়ভার তিনি শাসকদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর মতে, শাসিতদের অনুভূতি সম্পর্কে শাসকদের অজ্ঞতাই বিদ্রোহের মূল কারণ। তিনি বলেন, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয়দের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না বিধায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। তিনি আরো মনে করেন যে, নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারও সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায়। তদুপরি, যে বিশেষ কারণে ভারতীয় সরকার মুসলমানদেরকে বিদ্রোহের প্রধান হোতা মনে করে তা ছিল মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ কর্তৃক বিদ্রোহীদের নেতৃত্বদান। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ আহমদ খানের বক্তব্য ছিল এই যে, বৃদ্ধ সম্রাট স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি; তাঁর সেই ক্ষমতাও ছিল না। নেতৃত্ব তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের হাতের পুতুল। শাসকদের নীতির সমালোচনা সত্ত্বেও বৃটিশ ভারতীয় সরকার বুঝতে পারে যে, সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন। অতপর Loyal Mohammedans of India নামক অন্য একটি পুস্তকে তিনি বিদ্রোহীদেরকে দুষ্কৃতিকারীরূপে অভিহিত করেন এবং তাদের জন্য পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে অপরাধী সাব্যস্ত করার নীতির কড়া সমালোচনা করেন।

সৈয়দ আহমদ খান উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের যা বিশেষ করণীয় তা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মোন্নতির ব্যবস্থা এবং সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে প্রাগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করা। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি প্রথমে Scientific Society (১৮৬৪ খ্রি.) এবং পরে আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৭৬ খ্রি. তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন এবং আলীগড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

আলীগড় কলেজের জন্য তিনি উপযুক্ত ইংরেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকমন্ডলী নিয়োগ দান এবং তাদের হাতে ছাত্রদের লেখাপড়া ও চরিত্র গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আলীগড় আন্দোলনের মূলনীতি ছিল সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। সৈয়দ আহমদ মনে করতেন শাসকদের সহায়তা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষার ব্যাপকতর বিস্তারের জন্য ১৮৮৬ খ্রি. সৈয়দ আহমদ খান Mohammedan Educational Conference স্থাপন করেন। এই সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম কবি– সাহিত্যিকগণ নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ লাভ করেন। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনাও এর মাধ্যমে বিকশিত হয়। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পরও এই সংগঠন সক্রিয় ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ঢাকায় Mohammedan Education Conference-এর বিংশতিতম সভার সমাপ্তিপর্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ খানের রাজনেতিক মতাদর্শ স্পষ্টতর হয়– যা পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। ১৮৮৫ খ্রি. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে বিকাশমান জাতীয়তাবাদী চিন্তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দেন। কারণ, প্রথমত, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল যা স্যার সৈয়দের আনুগত্যের ধারণার বিপরীত ছিল। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস দলের নীতি ও কার্যাবলী মুসলিম স্বার্থের অনুকূল হবে না বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। স্যার সৈয়দের ঐ সময়কার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পরবর্তীকালের দ্বিজাতিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথম দিকে অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুও কংগ্রেস দলকে সমর্থনদানে বিরত ছিলেন। এর সুযোগ নিয়ে ১৮৮৮ খ্রি. সৈয়দ আহমদ খান United Indian Patriotic Association নামে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত একটা সংগঠন গড়ে তোলেন।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেস দলের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ইংল্যান্ড থেকে আগত স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল বৃটিশ আইনসভার খ্যাতনামা সদস্য চার্লস ব্রাড্‌ল। এর কার্য বিবরণী স্যার সৈয়দের উদ্বেগের কারণ হয়। কেননা এই সভায় ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলসমূহের কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নির্বাচনের ভিত্তিতে নিয়োগের দাবি জানানো হয়। নির্বাচনের নীতি চালু হলে পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে বলে স্যার সৈয়দ আশঙ্কা করেন। তথাপি পরবর্তী কয়েক বছরের সরকারি নীতি ও কার্যাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের সদস্য সংখ্যা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। একই সময়ে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক কোন্দল ও দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এর ফলস্বরূপ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association। এই সংগঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল–

১) ইংরেজ জাতি ও সরকারের নিকট মুসলিম সম্প্রদায়ের মতামত তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ;

২) রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা;

৩) বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য যে কোন সরকারি নীতির সমর্থন এবং ভারতে শান্তি ও আনুগত্যের উৎসাহ প্রদান করা।

এই সংগঠনের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং আসন সংরক্ষণের দাবি জানান। এ ধরনের দাবি-দাওয়া কয়েক বছর পর মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আরো পূর্ণতররূপে প্রকাশিত হয়। ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আলীগড় আন্দোলনের বিশেষ অবদান ছিল। ইসলাম ধর্মের যুক্তিসম্মত (rational) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল স্যার সৈয়দের ধর্ম-চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এজন্য অবশ্য তিনি রক্ষণশীল উলেমা কর্তৃক সমালোচিত হয়েছিলেন। উর্দু সাহিত্যের কতিপয় দিকপাল আলীগড় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁদের মধ্যে উলে- খযোগ্য হলেন– আলতাফ হোসেন হালী, মৌলভী নাজির আহমদ, মৌলভী জাকা উল্লাহ এবং শিবলী নোমানী।

আলীগড় আন্দোলন ভারতে মুসলিম জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর প্রভাব বাংলায়ও দেখা যায়। স্যার সৈয়দ বৃটিশ সরকারের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সমালোচিত হয়েছেন। তবুও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে এবং তাদের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার উন্মেষে আলীগড় আন্দোলনের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী ছিল।

সারসংক্ষেপ

আলীগড় আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭–১৮৯৮)। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য তিনি এই আন্দোলনে ব্রতী হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের উচিত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের সার্বিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া। আধুনিক শিক্ষাই হচ্ছে সেই উন্নতির প্রধান উপায়। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭৫ খ্রি. আলীগড়ে Mohammedan Anglo-Oriental College-এর গোড়াপত্তন করেন, যা পরবর্তীকালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করতেন। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে

তিনি মুসলমান সমাজকে কংগ্রেস পার্টির রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দেন। সাধারণভাবে মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Aziz Ahmed, *Islamic Modernism in India and Pakistan*. London, 1967.

২। S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review,* Dhaka, 1995.

অনুশীলনী–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ শাসকগণ কোন সম্প্রদায়কে প্রধানত দায়ী করতো?
(ক) হিন্দুদেরকে (খ) মুসলমানদেরকে
(গ) বাঙালিদেরকে (ঘ) সকলকে।

২। আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল–
(ক) আধুনিক শিক্ষা বিস্তার (খ) ইসলামী শিক্ষা বিস্তার
(গ) উর্দু ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করা (ঘ) সবগুলোই।

৩। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি স্যার সৈয়দের নীতি ছিল–
(ক) শত্রুতামূলক (খ) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক
(গ) আনুগত্যমূলক (ঘ) সবগুলোই।

৪। বৃটিশ ভারতে হিন্দুদের অবস্থা মুসলমানদের চেয়ে–
(ক) উন্নত ছিল (খ) অনুন্নত ছিল
(গ) সমকক্ষ ছিল (ঘ) সমকক্ষ ছিল না।

৫। রাজনীতিতে আলীগড় আন্দোলনের অবদান–
(ক) সাম্প্রদায়িকতা (খ) মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ
(গ) ধর্ম নিরপেক্ষতা (ঘ) সমাজতন্ত্রবাদ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্দশার কারণ কি?

২। স্যার সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থার নাম এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ উল্লেখ করুন।

৩। Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association-এর উদ্দেশ্যগুলো কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। আলীগড় আন্দোলনে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

২। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আলীগড় আন্দোলনের অবদান কি ছিল?

পাঠ - ৫

বাংলায় মুসলিম জাগরণ ঃ আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *আমীর আলীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *দু'জনের চিন্তা-ভাবনার তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে পারবেন;*
- *বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই নেতার অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী শতাধিক বছর বাংলার মুসলমানদের জন্য চরম দুঃসময় ছিল। সরকারি শিক্ষানীতি, ভূমিনীতি ইত্যাদির ফলে মুসলিম সমাজের সার্বিক অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। এর জন্য মুসলমান জনগণ নিজেরাও কম দায়ী ছিল না। নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে তাদের একাধারে অক্ষমতা ও অনিচ্ছা মুসলিম সম্প্রদায়ের অধপতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলায় যে নবজাগরণের জোয়ার আসে তার সঙ্গে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চল অপেক্ষা বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এই এলাকার মুসলমানদের দুর্দশার অভিঘাত সারা ভারতে অনুভূত হয়। বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় জীবনের সবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য তাদের নিত্য সহচরে পরিণত হয়।

এই অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দু'জন নেতার আবির্ভাব বাংলার মুসলমানদের জীবনে নতুন আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে। দেরিতে হলেও মুসলমান সমাজের একাংশের মাঝে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। এই জাগরণের বহিপ্রকাশ ঘটে নতুন শিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে। যে দুই নেতার চেষ্টায় মুসলিম সমাজে এই পরিবর্তনের সূচনা হয় তাঁরা হলেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৩খ্রি.) এবং সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯–১৯২৮ খ্রি.)। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও এরা দু'জন সমসাময়িক ছিলেন এবং নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে দুঃখের বিষয় যে তাঁরা একযোগে কাজ করেননি এবং দু'জনের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তথাপি তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে যে জাগরণের সৃষ্টি হয় তার যথাযথ মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

আবদুল লতিফ তৎকালীন পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির মাহমুদ। তাঁর পরিবার আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করা হতো। কাজী ফকির মাহমুদ ফারসি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন এবং কলিকাতার সদর দিওয়ানী আদালতে ওকালতি করতেন। নিজ পুত্রকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু সেই সময় মুসলমানদের জন্য কলিকাতা মাদ্‌রাসা ব্যতীত আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। হিন্দু কলেজের দ্বার শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে আবদুল লতিফ যাতে আরবি-ফারসি-উর্দুর সঙ্গে ইংরেজিতেও পারদর্শী হন সে ব্যাপারে তাঁর পিতা যত্নশীল ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে কিছুদিন একজন ধনীলোকের ব্যক্তিগত সচিবের পদে কাজ করার পর আবদুল লতিফ প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৮৬২ খ্রি. তাঁকে Bengal Ligislative Assembly-র সদস্য মনোনীত করা হয়। এই পদে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলমান। ১৮৮০ খ্রি. সরকার তাঁকে সম্মানসূচক নওয়াব উপাধি প্রদান করেন।

আবদুল লতিফের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল বাংলার মুসলিম সমাজকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলা। অবশ্য শিক্ষাগত ও সামাজিক ব্যাপারে আবদুল লতিফের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ রক্ষণশীল ছিল। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের নানা অযৌক্তিক চিন্তা-চেতনায় আঘাত করতে চাননি। যেহেতু উচ্চ শ্রেণীর মুসলিম পরিবার তাঁর সন্তানকে হিন্দু ও খ্রিস্টান শিক্ষক অধ্যুষিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে রাজি ছিল না, সেজন্য মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও অনেক সীমিত ছিল। আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসাকে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। ফলে সেখানে সরকারি সহায়তায় এ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ চালু এবং ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৫ খ্রি. হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করার সরকারি সিদ্ধান্তের পশ্চাতে আবদুল লতিফের বিরাট ভূমিকা ছিল। এই কলেজে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হয়। মহসীন ফান্ডের টাকা যাতে মুসলিম ছাত্রদের বেশি উপকারে আসে সেজন্যে তিনি চেষ্টা করেন এবং বহুলাংশে সফলও হন।

১৮৬৩ খ্রি. আবদুল লতিফ Mohammedan Literary Society গঠন করেন। নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা করে এই সমিতি জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করে। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন, আবদুল লতিফের কার্যাবলীও সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। মুসলমানগণ যাতে ইংরেজ শাসন মেনে নিয়ে নিজেদের বৈষয়িক উন্নয়নে মনোযোগী হয় এটাই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় মুসলমানদের মানস গঠন ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে শাসক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ধর্মগত কারণে মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য কিনা– বড়লাট লর্ড মেয়ো কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উইলিয়াম হান্টার 'Our Indian Musalmans' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন ১৮৭১ খ্রি.।

ধর্মীয় বাক-বিতন্ডার জটাজালে নিজেকে না জড়িয়েও আবদুল লতিফ কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রখ্যাত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর সহায়তা লাভে সমর্থ হন। ১৮৭২ খ্রি. আবদুল লতিফের অনুরোধে মাওলানা জৌনপুরী ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম' হিসেবে ফতোয়া দেন। ওয়াহাবিগণ প্রচারণা করছিল যে, ভারত "দার-উল-হারব" অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের উচিত বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। মাওলানা জৌনপুরী যুক্তি দেন যে, যেহেতু ভারতে মুসলমানগণ নিজ ধর্ম বিনা বাধায় পালন করতে পারে সে কারণে এদেশ 'দার-উল-ইসলাম'; কাজেই মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ফতোয়া অনুসারে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত হওয়া

মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্যের অংশ নয়। এটাই ছিল উক্ত ফতোয়ার তাৎপর্য। এভাবে বৃটিশ শাসনের প্রতি মুসলিম মানসে একটা আনুগত্যের বাতাবরণ তৈরিতে আবদুল লতিফ সাফল্য অর্জন করেন।

অবশ্য আবদুল লতিফের চিন্তা-ভাবনা রক্ষণশীলতা ও স্ববিরোধ থেকে মুক্ত ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে হয়েও তিনি ইউরোপের উদারনৈতিক ভাবধারা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। বাংলা ভাষা এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ছিল। Mohammedan Literary Society-র কার্যাবলী পরিচালিত হতো ইংরেজি, উর্দু, ফারসি ইত্যাদি ভাষায়; সেখানে বাংলার কোন স্থান ছিল না। তিনি নিজে বাংলা ভাষা ভাল জানতেন, কিন্তু চর্চা করতেন না। বাংলার মুসলমান সমাজে যে বৈষম্যমূলক আশরাফ-আতরাফ প্রথা প্রচলিত ছিল আবদুল লতিফ তার সমর্থক ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। ১৮৮২ খ্রি. ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) -এর নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা হবে উর্দু। শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা বাংলা; তবে সেই ভাষাকে আরবি, ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামিকরণ করতে হবে। এসব কারণে আবদুল লতিফের সংস্কার প্রচেষ্টা সীমিত গন্ডির ভেতর আবদ্ধ ছিল। তাই তাঁর সাফল্যও ছিল সীমিত। সে কারণে তিনি উত্তর ভারতে তাঁর সমসাময়িক সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম হননি।

আমীর আলী তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদমর্যাদা এবং পান্ডিত্যে তিনি তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। আমীর আলীর পিতা সা'দত আলী অযোধ্যার নবাবের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজ্য বৃটিশ কর্তৃক দখলীকৃত হওয়ার অল্প আগে তিনি বাংলায় চলে আসেন এবং হুগলীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। আমীর আলীর পরিবারও আরব-ইরানি বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতো। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে আমীর আলী হুগলী কলেজ থেকে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে) এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর বিষয় ছিল ইতিহাস। এরপর তিনি আইনে ডিগ্রি নেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। অল্পদিন পর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড গমন করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি Inner Temple থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। অতপর দেশে ফিরে এসে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আকর্ষণীয় আইন ব্যবসা গড়ে তোলেন। মুসলিম আইনে ব্যুৎপত্তির জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁকে ঐ বিষয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক নিযুক্ত করে। কয়েক বছর তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রি. তাঁকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করা হয়। এরপর তিনি অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রি. আমীর আলী সরকারি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে পুনরায় আইন ব্যবসাতে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে আইনজীবী হিসেবে তাঁর সুনাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই সময় তাঁর কার্যকলাপ আইন পেশার বাইরেও পরিব্যাপ্ত হয়। সরকার তাঁকে Bengal Legislative Council-এর সদস্য মনোনীত করে। ১৮৮৩ খ্রি. উদারপন্থী ভাইসরয় লর্ড রিপন তাঁকে Imperial Legislative Council-এর সদস্য পদে মনোনয়ন দান করেন। ১৮৯০ খ্রি. আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক পদে উন্নীত হন এবং পরবর্তী চৌদ্দ বছর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রি. অবসর নিয়ে তিনি ইংল্যান্ড গমন এবং ইংরেজ স্ত্রী ও দুইপুত্র নিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে আমৃত্যু বসবাস করেন। ১৯০৯ খ্রি. তিনি ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত Privy Council-এর সদস্যপদে নিযুক্ত হন। সেই পদে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়।

খ্যাতিপূর্ণ কর্মজীবনের পাশাপাশি আমীর আলী মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টাও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের উদার ও যুক্তিশীল (Liberal and Rational) ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থ– A Short History of the Saracens (১৮৮৯ খ্রি.) এবং The Spirit

of Islam (১৮৯১ খ্রি.)। দু'টি গ্রন্থই ইংল্যান্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে উভয় পুস্তকের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থটি আজ অবধি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কাছে এই পুস্তকের আবেদন খুব বেশি। দু'টি পুস্তকে তিনি ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। এই ব্যাপারে আমীর আলী স্যার সৈয়দ আহমদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ মনে করতেন ইসলাম প্রগতি বিরোধী নয়, আমীর আলী বিশ্বাস করতেন ইসলামই প্রগতি।

আমীর আলীর রাজনৈতিক চিন্তাও তাঁর সমসাময়িক অনেকের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং সেজন্য তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন দরকার। ১৮৭৭ খ্রি. তিনি National Mohammedan Association স্থাপন করেন। পরবর্তী ২৫ বছর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সংগঠনের ৫৩টি শাখা খোলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ১৮৮২ খ্রি. হান্টার কমিশনের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে এই সংগঠন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখে। মোটকথা, আধুনিক শিক্ষা এবং সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার পক্ষে আমীর আলী অক্লান্তভাবে কাজ করেন। তবে প্রধানত শিক্ষার প্রশ্নে আমীর আলীর সঙ্গে আবদুল লতিফের মতভেদ ছিল। আবদুল লতিফ মুসলমানদের জন্য ঐতিহ্যিক মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

আবদুল লতিফ ও আমীর আলী ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল এক অর্থাৎ মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধন। তাঁদের প্রভাব মূলত শহরকেন্দ্রিক উচ্চবিত্তের মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল। তবে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রতি তারা আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন একথা সত্যি, যদিও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান কৃষকদের পক্ষে তাদের ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করা সম্ভবপর ছিল না। সীমিত সাফল্য সত্ত্বেও এই দুই নেতা উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে নতুন জাগরণের সূচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের অবদান অকিঞ্চিৎকর মনে করার কোন অবকাশ নেই।

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম সমাজে অবক্ষয় ও অধপতনের অবস্থা বিরাজ করছিল এবং সে সঙ্গে ছিল নেতৃত্বের সংকট।এ অবস্থায় নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। উভয় নেতা সমসাময়িক ছিলেন এবং একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার এবং নবজাগরণ সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তারা একযোগে কাজ করতে সক্ষম হননি। তাদের মধ্যে অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশ্নে মতভেদ ছিল। আমীর আলী ছিলেন তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী; কিন্তু আবদুল লতিফ সংকীর্ণতা এবং রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। মতানৈক্য এবং নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দুই নেতা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমীর আলী স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা রাজনীতি সচেতনতা সৃষ্টিতেও সফল হয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলিকাতা, ১৯৮৭।

২। A.F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh: Tradition and Transformation,* Dhaka, 1987.

৩। Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh, 1704-1971,* Vol. I (Political History) Dhaka, 1992.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আবদুল লতিফ জন্মগ্রহণ করেন–
(ক) রাজশাহীতে (খ) ফরিদপুরে
(গ) কলিকাতায় (ঘ) বোম্বেতে।

২। আবদুল লতিফ শিক্ষা গ্রহণ করেন–
(ক) হুগলী কলেজে (খ) হিন্দু কলেজে
(গ) কলিকাতা মাদ্রাসায় (ঘ) প্রেসিডেন্সি কলেজে।

৩। Our Indian Musalmans নামক পুস্তকের লেখক ছিলেন–
(ক) সৈয়দ আমীর আলী (খ) উইলিয়াম হান্টার
(গ) লর্ড মেয়ো (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। আমীর আলী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল–
(ক) The Spirit of Islam (খ) Discovery of India
(গ) Orientalism (ঘ) None of them.

৫। আমীর আলী এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন কোন খ্রিস্টাব্দে–
(ক) ১৮৬৮ খি. (খ) ১৮৭২ খ্রি.
(গ) ১৮৯০ খ্রি. (ঘ) ১৯০০ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। শিক্ষার ব্যাপারে আবদুল লতিফের মনোভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। আমীর আলীর কর্মজীবন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলার মুসলিম জাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
২। সৈয়দ আমীর আলীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তার একটি বিবরণ দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (খ)।
পাঠ-২ ঃ ১। (ক); ২। (খ); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (ক)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (ঘ); ২। (গ); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (ঘ)।
পাঠ-৪ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (খ)
পাঠ-৫ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (ক)।